মংলু সর্দ্দার

সায়ন্তন ঠাকুর

৬ এপ্রিল। ১৮২৩

প্রায় পাঁচ মাস হল কলিকাতায় এসেছি। গত মাস থেকে এত তপ্ত হয়ে উঠেছে যে মনে হয় কোনও বয়লারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি! দ্বিপ্রহরে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায় না, পথঘাটও শুনশান, মাঝে মাঝে দু একটি ফিরিওয়ালার ডাক শুধু শোনা যায়। কয়েক মাস পূর্বের শীতকাল এদেশীয় রেশম বস্ত্রের মতো নরম ও উষ্ণ ছিল, সেই আরামদায়ক আবহাওয়া দেখে এখানকার জলবায়ু সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা আমার মনে জন্ম নিয়েছিল তা অচিরেই ধ্বংস হয়েছে। উজ্জ্বল রৌদ্র দেখলে এখন ভয় লাগে, ত্বক সর্বদা কেমন আর্দ্র হয়ে থাকে, মনে হয় যেন খাঁটি 'বাটার' মেখে বসে আছি!

জর্জ একটি ব্রুহাম গাড়ি চড়ে কোম্পানি অফিস থেকে মধ্যাহ্নে বাড়ি ফেরে, মুখখানি টকটকে লাল, সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা, ইদানিং লক্ষ্য করছি তার মেজাজ ইংলন্ডের আকাশের মতোই সর্বদা কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। গতকাল কুক দ্বিপ্রহরে পুডিং তৈরি করেনি বলে কী চিৎকারই না সে করল! পূর্বে জর্জকে কখনও এমন আচরণ করতে দেখি নাই। ইংলন্ডে থাকাকালীন অনেকের মুখে শুনেছিলাম ভারতবর্ষের জলবায়ু নাকি পুরুষ জাতিকে উগ্র ও অভব্য করে তোলে! কী জানি, হবেও বা।

তবে সূর্যাস্তের পর চারপাশ ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসে, হুগলি রিভারের দিক থেকে সুমধুর কণ্ঠস্বরের মতো বাতাস ভেসে আসে, একেকদিন বেশি রাত্রে গাড়ি নিয়ে আমরা বেড়াতে যাই। এদেশের পথের দুপাশে কত গাছপালা, মাঝে মাঝে মনে হয় সবুজ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে ভেসে যাচ্ছি, এরকম গাছপালার বাহার আমাদের দেশে কল্পনাও করা যায় না। বাড়ির অদূরেই কী একটা গাছ রয়েছে, পাতাগুলি টেউ খেলানো, তারার মতো সাদা সাদা ফুল হয়, সারা রাত্রি ধরে ফুলগুলি ফোটে আর দিনের বেলায় টুপটুপ করে গাছের তলায় ধুলার উপর খসে পড়ে। ফুলের সুবাসে চারদিক যেন আলো হয়ে থাকে, মংলু একদিন ওই ফুলগুলি দিয়ে আমাকে মালা গেঁথে দিয়েছিল, এদেশীয়দের মতো গলায় পরেছিলাম সেই মালা, তাই দেখে তার কী আনন্দ! মংলু বলেছিল ওই ফুলের নাম বকুল। বালক হলে কী হবে, মংলু অনেককিছু জানে! অনাথ এই বালকটিকে আমিও ভৃত্য হিসাবে দেখি না, এই কয়েকদিনেই কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। সে কিন্তু নিজেকে ভৃত্যদের প্রধান বলে মনে করে, কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে বিচিত্র মুখভঙ্গী করে বলে, আমি মংলু সর্দ্দার!

সন্ধ্যার পর জর্জ বেড়াতে যাওয়ার কথা তুললেই সে আমার কাছে এসে চোখ গোল গোল করে বলে, সন্দে লেগেচে, একন পতে শাঁকচুন্নী বসে আচে, মেম যেও না!

আজকাল এখানকার মানুষের মুখের ভাষা অল্প অল্প বুঝতে শিখেছি। ভাষাটি খুব মিষ্টি! মংলুর মুখেই শুনেছি, শাঁকচুন্নী এক ভয়ঙ্করী প্রেতিনী, সন্ধ্যার পর বঙ্গদেশের রমণীদের মতো লালপাড় সাদা শাড়ী পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে নাকি ঘুরে বেড়ায়! কোনও দিঘী বা পুকুরঘাটে বসে থাকে, অল্পবয়সী তরুণদের উপর তার ভারী লোভ!

আমরা অবশ্য শাকচুন্নীর ভয় অগ্রাহ্য করেই বেড়াতে যাই, জর্জকে আর যাই হোক তরুণ বলা যায় না! অতএব তার দিকে আশা করি শাকচুন্নী লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না। তবে আমাদের এই আচরণে মংলু যে মোটেই খুশী হয় না তা স্পষ্ট বুঝতে পারি। কিন্তু কলিকাতার রাত্রির সৌন্দর্য দেখার মতো, কৃষ্ণপক্ষের নির্মেঘ আকাশে অতীতকালের মতো নক্ষত্রদল ফুটে উঠেছে, নির্জন পথ জনমানবশূন্য, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে গাছপালা ঝোপঝাড়ের মাথায় গহনার মতো আলো-পোকা জ্বলছে আর নিভছে, এদেশীয়রা বলে জোনাকি, অদূরে হুগলি নদীর উপর সারি বেঁধে পালতোলা নৌকো আর জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমরা ময়দান অবধি যাই তারপর আবার ফিরে আসি। তবে শুক্লপক্ষে যেদিন চাঁদ ওঠে সেদিন রহস্যময়ীর মতো হয়ে ওঠে চরাচর, যেন জন কীটসের কোনও কবিতা। যুবতীর

আলুলায়িত কেশরাজির মতো জ্যোৎস্নার সুবাস পাই, শুধুমাত্র এই জ্যোৎস্নাসঙ্গ লোভেই আমি সুদূর ইংলন্ড থেকে বারবার করে এখানে, এই অপরূপা বঙ্গদেশে আসতে পারি।

তবে কবির মতো এই মনের ভাব পরের দিন সকালে আর থাকে না, উষ্ণতা তো রয়েছেই তার সঙ্গে মশা আর মাছির উপদ্রবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। এই মশক দেখতে অতিক্ষুদ্র কিন্তু দংশন করলে তার বিষ এবং জ্বালা সম্যক বোঝা যায়। গুন গুন করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়, তাদের দেহে একটি করে অতিসূক্ষ্ম হুল আছে, সেটি সূঁচের মতো বিঁধিয়ে রক্তপান করে। এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া ভীষণ কঠিন।

এই যে এখন টেবিলে বসে সেজবাতির আলোয় লিখছি আর পায়ের পাতা জ্বালা করছে, নিশ্চয় ওই রক্তপায়ীর দল এসেছে!

রাত্রি হয়েছে, ওই যে মেকাবি ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা পড়ল। উইলিয়ম স্মিথের গৃহে আজ আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, জর্জ গেছে, তার ফিরতে মনে হয়ে অনেক দেরী হবে। আমার শরীরটা ভালো নাই, তাছাড়া এই ধরণের পার্টি আজকাল কেন জানি না একেবারেই ভালো লাগে না। ঘুম পাচ্ছে, শুয়ে পড়ি। কাল অনেক ভোরে উঠব, মংলুকে নিয়ে ময়দানে সূর্যোদয় দেখতে যাব।

বেটি ফ্রান্সিস। কলিকাতা।

২২ এপ্রিল। ১৮২৩

কয়েকদিন পূর্বে মংলুর কথা শুনে স্থির করলাম হিন্দুদের চড়ক পূজার উৎসব দেখতে যাব। জর্জ বৈকালে অফিস থেকে ফিরলে আমরা তিনজন ব্রুহাম গাড়ি নিয়ে কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা দিলাম। আমাদের চৌরঙ্গীর গৃহ থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দক্ষিণে কালীঘাট, গঙ্গার তীরে হিন্দুদের দেবী কালীর মন্দির রয়েছে সেখানে। কিছু দূর যাওয়ার পরই ভিড়ে গাড়ি আটকে গেল, অসংখ্য মানুষ পথের উপরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোচোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এখানেই চড়ক পূজার মেলা বসেছে। আমাদের ঘোড়াগুলি অত লোকজন দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল, গাড়ি থেকে নামলাম আমরা, মংলুর উৎসাহ দেখার মতো। মেলা তার বালক জীবনে একটি আশ্চর্য বস্তু, কত রকমের যে লোক জড়ো হয়েছে, পথের দুপাশে ছোট ছোট দোকান বসেছে, এই বড় একখান ড্রামের মতো জিনিস কাঁধে নিয়ে বাজাচ্ছে কিছু লোক, ঢ্যাং ঢ্যাং করে শব্দ হচ্ছে। মংলুর কাছে শুনলাম, এদেশীয় বাদ্য যন্ত্রের নাম 'ঢাক'। সেটি বাজাতে বাজাতে আরেক দল লোক চলেছে সামনের দিকে, পথ ধুলায় ভরে গিয়েছে, অপরাহ্নের মলিন আলো আর ধুলায় চারপাশ কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বাজনদারদের মুখে বিচিত্র ধ্বনি – ভোলা বোম ভোলা বোম! মংলু দেখি সুর করে বলছে, জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা, জিজ্ঞাসা করলাম এর অর্থ কী, ফিক করে হেসে বলল, ও তুমি বুজবে না মেম! দুপাশে সার সার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, স্ত্রীলোক ও শিশুও রয়েছে, তারাও সকলে মিলে ধুয়া তুলেছে- বোম বোম হরে বোম। হঠাৎ মানুষের চিৎকার আর বাজনার শব্দে এক বাবুর গাড়ির ঘোড়া ক্ষেপে উঠল, হুড়মুড় করে ছুটে গেল দোকানের দিকে, হইহই করে উঠল সবাই। মংলুর হাত ধরে আমরা একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম।

সামনে একখানি লম্বা কাষ্ঠদন্ড পোঁতা হয়েছে, মংলুর কাছে জানলাম ওটিকেই চড়ক গাছ বলে। একদল লোক ওই গাছ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাথায় লম্বা চুল জট পাকিয়ে পিঠের উপর পড়ে রয়েছে, সর্বাঙ্গে ছাইয়ে ঢাকা, কোমরে একটুকরো সাদা কাপড় কোনওক্রমে জড়ানো, চোখদুটি টকটকে লাল, এদেশে এই মানুষদের 'সন্ন্যাসী' বলা হয়, সবাই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন চোখ বন্ধ করে একহাত উপরের দিকে তুলে মাটির উপর স্থির হয়ে বসে আছে, আরেকদল মানুষের বাহুর মাংসপেশীর মধ্যে তীক্ষ্ণ শলাকা বিঁধানো হয়েছে, অথচ হাসিমুখে তারা ঢাকের তালে তালে নৃত্য করছে! কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কেউ আবার জিভের মধ্যে শলাকা বিঁধিয়েছে, এ জিনিস বেশিক্ষণ চোখে দেখা যায় না। শুনলাম ওই চড়কগাছের মাথায় দুজন লোককে নাকি পিঠে তীর ফুটিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে আর তারা দুপাশে ঝুলে ঝুলে পাক খাবে। আমার শুনেই শরীর খারাপ করতে লাগল, জর্জকে বললাম, তাড়াতাড়ি আমায় বাড়ি নিয়ে চলো। বেচারা মংলু আমার কথা শুনে খুবই হতাশ হল, মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। একটি দোকান থেকে তাকে কতকগুলি কাঠের খেলনা কিনে দিলাম, প্রতিটি চার পয়সা করে দাম নিল। খেলনা পেয়ে সে বোধহয় একটু খুশি হল।

কালীঘাট আর যাওয়া হল না, ফেরার পথে দেখলাম কলিকাতারা বাবুরা গাড়ি বোঝাই করে আসছে। তাদের সকলের সঙ্গেই নারীরা রয়েছে, জর্জ আমাকে চুপিসারে বলল, তারা নাকি সবাই বারাঙ্গানা। যেমন তাদের পোশাক তেমনই রূপ। অনেক বাবুর হাতেই দেখলাম মদের বোতল, এই রমণীদের মধ্যে অনেকেই নাকি প্রকাশ্যেই নাচবে, আর তাদের দেখার জন্য ভিড় করবে বহু হিন্দু ভদ্রলোক! বিচিত্র এদেশের রুচি। প্রায় সন্ধে হয়ে এল, পথে একটি দুটি করে জ্বলে উঠছে রেড়ির আলো, এই অসহ্য ভিড় থেকে দূরে আমার নির্জন গৃহকোণের জন্য সহসা মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

বেটি ফ্রান্সিস। কলিকাতা।

৬ জুন। ১৮২৩

আজ সকাল থেকে এলোমেলো বাতাস বইছে, আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, মাঝে মাঝেই বিকট শব্দে বাজ পড়ছে। এমন বাজের শব্দ ইংলন্ডে থাকতে কখনও শুনিনি। তার সঙ্গে কী বৃষ্টি, মনে হয় পৃথিবীতে যেন প্রলয় এসেছে। বাহারি গয়নার মতো বিদ্যুৎ রেখা ঝলসে উঠছে, গাছপালাগুলিও মাথা দুলিয়ে নৃত্য শুরু করেছে। এখন সকাল সাতটা, এরমধ্যেই আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। সেজবাতি জ্বালিয়ে বৈঠকখানায় বসে এই ডাইরি লিখছি, মংলু একবার করে দৌড়ে বারান্দায় যাচ্ছে আবার কয়েক মুহূর্ত পর ঘরে ফিরে আসছে। সে বাড়ির কাজকর্ম তেমন কিছু করে না, সারাদিন খেলাধূলা করে, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে সবাইকে হাসানোর চেষ্টা করে, অনেক পশুপাখির ডাকও হুবহু নকল করতে পারে। জর্জ বলে আমার আশকারাতেই নাকি মংলু মাথায় চড়ে বসেছে। কথাটা হয়তো খুব মিথ্যা নয়, কিন্তু কী করব, মাতৃহারা এই বালককে দেখলেই কেন জানি না আমার অ্যালেক্সের কথা মনে পড়ে যায়। অ্যালেক্স ফ্রান্সিস, আমার ছেলে, পাঁচবছর আগে সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। পশ্চিম লন্ডনের সমাধিক্ষেত্রে সে একাই থাকে, সমাধির উপর একটি চিনার গাছ থেকে টুপটুপ করে পাতা খসে পড়ে, আটবছরের বালকের কী এখনও আমার কথা মনে পড়ে?

গতকাল মংলুকে ছবি এঁকে দেখাচ্ছিলাম, হাতির ছবি সিংহের ছবি। হাতি দেখে তার কী আনন্দ, বলে,

— এ হাতি!

— আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

— তুমি দেখেছ হাতি?

— হ্যাঁ!

— কোথায় দেখলে?

— একবার হাতি এয়েচিল!

—কোথায় এসেছিল?

— গাঁয়ে!

— তোমাদের গ্রামে?

— গ্রামে কে কে ছিল?

পূর্বেও দেখেছি গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মংলু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

— নদী ছিল, মা ছিল।

— আর? বাবা ছিল না?

বাবার কথা শুনে কোনও উত্তর দেয় না, মাথা নিচু করে বসে থাকে।

আমাদের খানসামা রামপ্রসাদ মংলুকে এখানে নিয়ে এসেছিল, তার মুখে

শুনেছি বাবা যখন কলেরা রোগে মারা যায় তখন মংলুর বয়স মাত্র ছ'মাস। পিতার স্মৃতি তার নাই, মা মারা যাওয়ার পর রামপ্রসাদের বাড়িতেই ছিল তারপর এখানে, এই বয়সেই কেমন নৌকার মতো মংলুর জীবন এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে বয়ে চলেছে।

মংলুকে বাড়ির অন্যান্য ভৃত্যরা তেমন কেউ সহ্য করতে পারে না, একটি বালকের প্রতি তাদের ঈর্ষা দেখলে অবাক হয়ে যাই! এরা কি মানুষ! নানারকম কথা আমার কানে তোলে, এই তো সেদিন একজন ভৃত্য বলল সে নাকি সচক্ষে মংলুকে আমার ড্রয়ার থেকে পয়সা চুরি করতে দেখেছে। আমি বিশ্বাস করিনি, ড্রয়ারে টাকা পয়সা গোনা থাকে না, ফলে কেউ নিলেও বুঝতে পারব না, কিন্তু মংলু যে নেয়নি সে বিষয়ে আমি একশোভাগ নিশ্চিত, সরল বালক পয়সা চুরি করবে কেন! আমার অবিশ্বাস দেখে সেই ভৃত্য বলল চালপড়া দিলেই নাকি সত্য বেরিয়ে আসবে। এদেশে চোর ধরার এক অভিনব উপায় ওই চালপড়া, জর্জের মুখে শুনেছি ওঝা এসে মন্ত্র-পড়া একমুঠি চাল সবাইকে মুখে নিয়ে দাঁড়াতে বলে, তারপর চিবিয়ে সামনে রাখা কলাপাতার উপর ফেলতে হবে, যে চোর তার মুখের চাল নাকি ভিজবে না, শুকনো থাকবে! চোর ধরার এমন আশ্চর্য উপায়ের কথা পূর্বে কখনও শুনিনি। তবে জর্জ বলছিল এতে নাকি সত্যই চোর ধরা পড়ে! কী জানি, হয়তো যে চুরি করেছে ধরা পড়ার ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় তাই চাল ভেজে না, হতেই পারে! বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ। যাদুমন্ত্র, তুকতাক, ভূতপ্রেত, ফকিরদের খুব কদর এখানে! তবে ওইটুকু বালককে ওঝার সামনে দাঁড় করাব, ছিঃ! ওই ভৃত্যকে কড়া ভাষায় বলে দিয়েছি, ভবিষ্যতে মংলুর নামে এইরকম কথা যেন আর কখনও সে না বলে।

আগামীকাল আমাদের বন্ধু মি. ডেভিড সপরিবারে বারাণসী বেড়াতে যাচ্ছেন। শুনেছি বারাণসী নাকি অপূর্ব সুন্দর এক নগর, জর্জকে বলেছিলাম আমরাও তো তাঁদের সঙ্গে যেতে পারি! জর্জ রাজি হল না, কোম্পানির কী সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ নাকি বাকি পড়ে রয়েছে। আসলে অ্যালেক্স চলে যাওয়ার পর থেকেই জর্জ ক্রমশ অসামাজিক হয়ে উঠেছে, ইদানীং তার মদ্যপানের মাত্রাও বেড়ে গেছে। বাড়িতে থাকলেই ক্ল্যারেট না হয় হুইস্কির বোতল খুলে বসে। মদ এখানে যথেষ্ট সস্তা, একবোতল ভালো হুইস্কির দাম মাত্র চার টাকা। ইংলন্ডের লোকেরা বিশেষত নূতন কেল্লার সৈনিকরা সস্তায় মদ পেয়ে আকণ্ঠ পান করে, তার সঙ্গে রয়েছে এদেশের তীব্র গরম, ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, সৈন্যদের মধ্যে মৃত্যুর হারও খুব বেশি।বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়েই চলেছে, জর্জ মনে হয় আজ আর অফিস যেতে পারবে না।

এমন বৃষ্টিদিনে আমার মন পড়ে রয়েছে বারাণসীর দিকে, কেমন যোলো কি কুড়ি দাঁড়ের পানসি নিয়ে মি. ডেভিডরা গঙ্গায় ভেসে ভেসে নূতন দেশের দিকে যাবেন, দুপাশে ছোট ছোট গ্রাম, প্রান্তর, বঙ্গদেশের গ্রামগুলি ছবির মতো, একবার এখান থেকে ফলতা যাওয়ার পথে দেখেছিলাম, আহ! আমিও যদি যেতে পারতাম।

তবে বারাণসী যাওয়ার খরচ অনেক, মি. ডেভিডের স্ত্রী অ্যানা সেদিন বলছিল তাঁদের যেতে নাকি তিন-চার মাস সময় লাগবে! পানসির ভাড়া দৈনিক কুড়ি টাকা, অর্থাৎ নৌকো ভাড়াই পড়বে প্রায় আড়াই হাজার টাকা, এছাড়া বাবুর্চি খানসামা হেডকুক, খাদ্যদ্রব্য, মদের বোতল সেসব তো রয়েইছে সব মিলিয়ে ছ-সাত হাজার টাকা, খরচের বহর নেহাত কম নয়!

বেটি ফ্রান্সিস। কলিকাতা।

১২ জুলাই। ১৮২৩

এখন রাত্রি এগারোটা বাজে, কিছুক্ষণ পূর্বে বাড়ি ফিরেছি। আজ সন্ধ্যায় এক বাবুর বাড়ির ভোজসভায় নিমন্ত্রণ ছিল, আমি আর জর্জ দুজনেই গেছিলাম, পরিবারটি সম্ভ্রান্ত, আদব কায়দাও ইউরোপীয়দের মতো,বাঙালি বাবুটির নাম রামমোহন রায়। গৃহখানি বেশ বড়, নানাবর্ণের আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল, মাঝখানে উঠান ঘিরে চারদিকে দালান, বৈঠকখানায় আমাদের বসার আয়োজন করা হয়েছিল। দেওয়ালে নানারকমের তৈলচিত্র চোখে পড়ল, অধিকাংশই ইউরোপের কোনও শিল্পীর আঁকা, বেশ বড় ঘর, কড়ি বরগার ছাদ থেক হাতে টানা সুদৃশ্য ঝালর দেওয়া সিল্কের পাখা ঝুলছে, একখানি পিয়ানোও চোখে পড়ল। মার্বেল পাথরের বড় টেবিল আর উঁচু উঁচু গদি আঁটা চেয়ার দিয়ে বৈঠকখানা সাজানো, সাদা রঙের একখানি পরীর মূর্তি রাখা টেবিলের উপর, কী অপূর্ব মূর্তিটি, দেখে মনে হয় এখনই পাখা মেলে উড়ে যাবে। বড় বড় জানালাগুলি খোলা রয়েছেম মৃদু বাতাস বইছে, জানালার ওপারে সম্ভবত বাগান, কী একটা ফুলের সুবাস ভেসে আসছে। ঘরের এককোণে গোল তেপায়া টুলের উপর চিনামাটির পাত্রে জল কতগুলি সাদা ফুল রাখা আছে, ভারী সুন্দর দেখতে, ঠিক যেন একমুঠি শ্বেত মুক্তোর দানা, কিন্তু ওই ফুলের নাম আমি জানি না। বাবু রামমোহন বেশ সৌখিন মানুষ, ফিনফিনে সাদা ধুতি আর জমকালো চাপকান পরেছেন, গায়ে একখানি সিল্কের চাদর আলগোছে ফেলা, মাথায় বিচিত্র টুপি, পায়ে ঝকঝকে পালিশ করা পাম্প-শু, চোখে মুখে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট, পরিস্কার ইংরাজিতে তিনি অতিথিদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। একবার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জানতে চাইলেন, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। আমিও হেসে বললাম, বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না।

পুরুষরা সবাই দেশীয় নিজেদের মধ্যে দেশীয় অর্থনীতি কোম্পানির নানা পলিসি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, আর আমরা, দু-চারজন রমণী যাঁরা এসেছি, বোকার মত চুপ করে বসে ছিলাম। মাঝখানে একবার সতীদাহ প্রথা নিয়ে কথা উঠল, বাবু রামমোহন সে-কথায় বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, নানাবিধ যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন কেন এই বর্বর প্রথা দেশ থেকে আইন করে তুলে দেওয়া উচিত, কথাগুলি আমার যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ মনে হল। মানুষটিকেও হৃদয়বান পুরুষ বলে মনে হল, নারীদের যন্ত্রণা সচরাচর পুরুষরা বুঝতে পারেন না বা বলা ভালো বোঝার চেষ্টা করেন না, বাবু রামমোহন রায়কে তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। হিন্দু রমণীর সতী হওয়ার কথা ব্যাখ্যা করার সময় তাঁর চোখদুটি ক্ষণিকের জন্য সজল হয়ে উঠেছিল, আমি খেয়াল করেছি।

নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও সুরার ব্যবস্থা ছিল। এদেশীয় ফল আম ছিল প্রচুর পরিমাণে, পোশাক নষ্ট হওয়ার ভয়ে যদিও আমি তা মুখে দিইনি! একখানি সাদা গাউন পরেছিলাম আজ, মি.ফক্সের স্ত্রী আড়চোখে আমায় দেখছিল! একপাত্র শেরি খেলাম, এই সময় কলিকাতায় শেরি সহজে পাওয়া যায় না। বাড়ি ফেরার পথে অল্প বৃষ্টি হল। ফিরে দেখি মংলু ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশ কাটল আজ সন্ধ্যাটি।

বেটি ফ্রান্সিস। কলিকাতা।

২০ জুলাই। ১৮২৩

দুদিন থেকে মংলুর খুব জ্বর, মলিন মুখে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। প্রাণচঞ্চল বালকের হাসি, খেলা, জীবজন্তুর ডাক নকল করে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, গৃহখানি কেমন নিঝুমপুরীর মতো হয়ে উঠেছে। ড. উইলসন এসেছিলেন গতকাল সন্ধ্যায়, তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারলেন না, বললেন জ্বর বাড়ালে ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে দিতে, ভাত দিতে নিষেধ করেছেন। সারা রাত্রি মাথার পাশে জেগে বসে ছিলাম, মংলু বারবার করে বলছিল, ও মেম তোমার দুটি পায়ে পড়ি, চাট্টি ভাত দাও, খুব খিদে পাচ্ছে।

কী করব, আমি নিরুপায়, ড.উইলসনের কথা অমান্য করি কী করে।

আমি নিজেও কিছু খাইনি, গভীর রাত্রে জ্বরের ঘোরে ক্লান্ত হয়ে মংলু ঘুমিয়ে পড়েছে, একখন্ড চাঁদ উঠেছে তখন আকাশে হলুদ মরা আলো এসে পড়েছে তার মুখে। বাইরে কী একটা রাতচরা পাখি ডাকছে, জর্জ এখনও বাড়ি ফেরেনি, বৈঠকখানায় এক বালকের কন্ঠস্বর যেন শুনতে পেলাম। এই কন্ঠস্বর আমার চেনা, তবে কি সে এলো ?

বেটি ফ্রান্সিস। কলিকাতা।

২১ জুলাই। ১৮২৩

জ্বর আজও কমেনি, কম্পাউন্ডারের হাত দিয়ে একটা মিক্সচার পাঠিয়েছেন

ড. উইলসন, কিন্তু তাতেও জ্বরের উপশম হচ্ছে না। রামপ্রসাদ এসে বলছিল এদেশীয় এক ওঝা এই অসুখ সারাতে পারে, মংলুর শরীরে নাকি কোনও প্রেত ভর করেছে। আমি এসব বিশ্বাস করি না কিন্তু এইবার অবিশ্বাসও করতে পারছি না, গতকাল রাত্রে ওই বালকের কণ্ঠস্বর ভুলি কী করে! জর্জকে বললাম, সে কড়া ভাষায় বলল ওসব ওঝা যেন ভুলেও এ বাড়িতে পা না দেয়। কিন্তু আমি একবার অ্যালেক্সকে হারিয়েছি, মংলুকে যেতে দেব না কিছুতেই।

এখন বেলা প্রায় চারটে, আজ খুব রৌদ্র, অসহনীয় গরম পড়েছে। বাইরে আগুনের হলকার মতো বাতাস বইছে, কিছুক্ষণ পূর্বে মংলু-জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল,

আমি যাচ্চি না কোতাও, মেম, একবার মায়ের কাচে.....মুড়কি দেবে খেতে.....আমি চড়কের মেলায় যাব...মেম, তুমি কি চলে যাবে, ওরা বলচিল...কী কত্তে ডাকবে ওকে....আমি তোমাকে নিয়ে যাব....আমি চুরি করিনি, ওরা বলচিল...এই অসুক ভালো হবে না মেম....তোমাকে একদিন হাতির ডাক শোনাব...সায়েবকে বলো না গো আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে....যা কত্তে বলবে সব কব্বো....

অসহায় হয়ে মংলুর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি। গাঢ় নীলরঙা আকাশে দু একটা চিল উড়ে বেড়াচ্ছে, কেমন ঝরঝরে বাতাস বইছে, আমার ভালো লাগছে না কিছু। হে যেশাস, মংলুর যেন কিছু না হয়, ওকে তুমি সুস্থ করে তোলো প্রভু। আর লিখতে ভালো লাগছে না। জর্জের কোনও হেলদোল নেই, আশ্চর্য, কেমন অমানবিক নিষ্ঠুর মানুষে পরিণত হয়েছে।

বেটি ফ্রান্সিস। কলিকাতা।

২২ সেপ্টেম্বর। ১৮২৩

আজ ঠিক দু'মাস হল, ওরা তো আমাদের মতো সমাধি দিতে দেয় না, ওইটুকু অনাথ বালককে ওরা সবাই মিলে পুড়িয়ে দিল। আমি আর কখনও মংলুকে দেখতে পাব না। আমরাও কলিকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কোম্পানি জর্জকে লক্ষ্ণৌ বদলি করেছে। আগামী সপ্তাহে রওনা দেব। এক এক করে এখানকার জিনিসগুলি বিক্রি করে দিচ্ছে জর্জ, অত মালপত্র নিয়ে নাকি যাওয়া যাবে না। গতকাল একজন এসে বেলজিয়াম গ্লাসের আয়নাখানি নিয়ে গেছে, ওই আয়নায় মুখ দেখতে মংলু বড় ভালবাসাতো, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কী একটা পাখির ডাক নকল করতো। কতবার জর্জকে বললাম বিক্রি না করতে, কে শোনে আমার কথা! সে আজকাল বলে আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কী জানি! সত্যই হয়তো মাথার ঠিক নাই।

দ্বিপ্রহরে এখন সব জানালাগুলি খুলে বসে আছি, ওই যে বকুল গাছটি দেখতে পাচ্ছি, আমাকে সে একদিন ফুলের মালা গেঁথে দিয়েছিল, আর তো কই ফোটে না, গাছও হয়তো শিশুর ভালোবাসা বুঝতে পারে। চারদিক আলো করে রৌদ্র উঠেছে এখন কেমন পানসির মতো আকাশ, খন্ড খন্ড সাদা মেঘ ভেসে ভেসে কোথায় যেন চলেছে। ঝরঝর বাতাস বইছে, এমন বেদনার মতো বাতাস আগে কখনও দেখিনি। মাঝে মাঝে শুনি চিকন গলায় কে যেন বলছে, মেম, ও মেম, আমার অসুক ভালা হবে না ?!

বেটি ফ্রান্সিস। কলিকাতা।

৩০ সেপ্টেম্বর। ১৮২৩

আজ মংলুকে ছেড়ে লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছি। বাড়ির সামনে বগি গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চাঁদপাল ঘাট থেকে আমাদের নৌকো ছাড়বে সেই বিকেলে। এই ডায়রিটি রেখে যাচ্ছি এখানেই, প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে মংলু যেন এসে দেখতে পায়, সে যেন বুঝতে পারে সবাই তাকে ভুলে গেলেও তার 'মেম' তাকে কখনও ভোলেনি।

বেটি ফ্রান্সিস। কলিকাতা।